KATHOPOKATHAN - ATIT O BARTAMAN
DOUBLE-BLIND PEER-REVIEWED JOURNAL
Website – kathopokathan.in Email - kathopokathanjournal@gmail.com
Volume : 01, Issue : 01, (July - December) 2024
Published On 15th September 2024

# সরস্বতী সেন, উনিশ শতকের একজন নারী শিক্ষার পথিকৃত : প্রসঙ্গ গোবরডাঙ্গা

স্বাগতা ভৌমিক
প্রাক্তনী, ইতিহাস বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

**সারসংক্ষেপ**

সমাজ সংসারে নারীকে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সর্বদাই যেন সমাজের সাথে এক লড়াইয়ের মাধ্যমে চলতে হয়েছে।সময়কালটা উনিশ শতক সেই সময় নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহন ছিল অসম্ভব ছিল বললেই চলে।সেই সময়ে দাঁড়িয়ে তৎকালীন সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলিকে কাটিয়ে গোবরডাঙ্গার খাটুরা গ্রামের মেয়ে সরস্বতী সেন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নিজেকে শিক্ষিত করে সমাজে নারী উন্নয়ন এর যে ভূমিকা নেন তা সত্যিই দৃষ্টান্ত স্বরূপ।কার্তিক চন্দ্র পাল ও পিতাম্বরিদেবীর ঘরে ১৮৪৮সালে জন্ম হয় সরস্বতী সেনের।বরাহনগর নিবাসী রামসেবক সেনের পুত্র শ্রীনাথ সেনের সাথে নয় বছর বয়সে সরস্বতীর বিয়ে হয়ে যায়,১৮৫৭সালে,মাত্র দুই বছরের মধ্যেই তিনি বিধবা হন।মামা ক্ষেত্রমোহন ও মামিমা কুমুদিনীর সংস্পর্শে এসে তার জীবনবোধের পরিবর্তন হয়।মামাতো ভাইদের সাথে ধাপে ধাপে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করেন সরস্বতী।সেই সময় মামা ক্ষেত্রমোহন দত্তের বাড়িতে আগমন ঘটে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম ব্যক্তিত্ব রামতনু লাহিড়ীর,সেখান থেকেই ব্রাহ্ম আদর্শে প্রভাবিত হন তিনি।পরবর্তীতে বেথুন স্কুলে শিক্ষা গ্রহন করেন সরস্বতী।খাঁটুরা বালিকা বিদ্যালয়েও তিনি শিক্ষকতা করেন।হিন্দু পরিবারের বিধবা মহিলাদের দূঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তির উপায় তিনি একমাত্র সাবলম্বী হওয়াই মনে করেছিলেন ও সেইমত নারী শিক্ষার বিস্তারে তিনি অগ্রনী হন।সেইমত কিছু রচনাও করেন যেমন-'প্রার্থনা','মাঘোৎসব' প্রভৃতি।খাঁটুরায় মামা ক্ষেত্রমহনের ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার সাথে তিনি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন।বেথুন স্কুলে শিক্ষকতা করে ও সারাজীবনে যা উপার্জন করেছিলেন এই মন্দিরে ও নারীশিক্ষার উন্নতিতে তিনি ব্যায় করেন।১৯২৯সালে এই মন্দিরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।উনিশ শতকে দাঁড়িয়ে মেয়েদের অবলা থেকে সবলা হতে তিনিই শিখিয়েছিলেন।'সরস্বতী' তার নাম প্রকৃতঅর্থেই ছিল সার্থক যা তিনি তার কাজের মাধ্যমে বুঝিয়েছিলেন।

**সুচকশব্দঃ** সমাজ, নারী, শিক্ষা, সরস্বতী সেন, গোবরডাঙ্গা

প্রাচীনকাল থেকে নারীকে সমাজে তার আধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানান সমস্যার সন্মুখীন হতে হলেও বর্তমানে সেই পরিস্থিতি কিছুটা বদলেছে। তবুও সমাজ সংসারে নারীকে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যেন পুরুষতন্ত্রেরই দ্বারস্থ হতে হয়, তা স্বাভাবিক নিয়মে হয়না। একজন নারী সমাজে কেবল একজন স্ত্রী নন তিনি তার পরেও কোন একজনের ঠাকুমা, দিদিমা, মা অথবা মাতৃস্থানীয়া আবার দিদি, বৌদি, বোন, কন্যা, নাতনি হয়ে থাকেন। এই কারনেই একজন নারীর পক্ষে সমাজ সংসারের মধ্যে থেকে পুরুষ তন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা বড়ই কঠিন হয়ে দাড়ায়। সহানুভুতির মানুষ না পেলে বাধ্য হয়েই সামাজিক পারিবারিক বঞ্চনাকেই মেনে নিতে হয়, এবং

এটাই হয়ে আসছে যুগ-যুগ ধরে। বর্তমানে নারীরা অনেক এগিয়ে গেলেও এই দৃষ্টান্ত আজও সমাজের অনেক অংশেই বর্তমান।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা উচ্চ বর্ণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল না। প্রয়োজনবোধে বিশেষ ক্ষেত্রে পারিবারিক বা গৃহশিক্ষাই উচ্চবর্ণের কন্যা সন্তানদের মধ্যে উপযুক্ত বলে মনে করা হত। নিম্নবর্ণের মধ্যে কন্যা সন্তানদের শিক্ষা ছিল কল্পনার বাইরে। সমাজের অধিক বয়সের পুরুষের সাথে অল্প বয়সি বালিকার বিবাহের প্রচলন ছিল। ফলে অধিক পরিমানে অল্প বয়সি কন্যা সন্তানদের বৈধব্য জীবনযাপন করতে হত। বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ হলেও তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ তাকে তেমন ভাবে মেনে নেয়নি। তার উপরে ছিল মর্মান্তিক সহমরন বা সতীদাহ প্রথা। এমনই এক সামাজিক অবস্থার শিকার হয়েছিলেন যে সমস্ত নারী তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন অধুনা উত্তর ২৪ পরগনার অন্তর্গত খাঁটুরা গ্রামের সরস্বতী সেন। তৎকালীন সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলি অতিক্রম করে সরস্বতী সেনের মত নারীরা কিভাবে শিক্ষাগ্রহন করেছিলেন তা উল্লেখের দাবি রাখে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে শিক্ষা গ্রহন করা, ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলনের সাথে যুক্ত হওয়া এইগুলো সত্যি দৃষ্টান্ত স্বরুপ।

সরস্বতী সেনের জীবনের শৈশব, কৈশোর খাঁটুরা গ্রামেই কেটেছিল। কৈশোরের মাত্র দুটি বছর কেটেছিল বরাহনগরে তার শ্বশুরালয়ে। যৌবনের মূল্যবান সময় অতিবাহিত হয় খাঁটুরা গ্রামে। সরস্বতী খাঁটুরার মধুকৌল্য পাল বংশের কীর্তিমতী কন্যা। সরস্বতী খাঁটুরা গ্রামে ১৮৪৮ সালের জুলাই মাসে জন্মগ্রহন করেন। তার পিতা ছিলেন কান্তি চন্দ্র পাল ও মাতা পিতাম্বরি দেবী। জন্মসূত্রে খাঁটুরা গ্রামের দত্ত বাড়ি তাঁর মাতুলালয়। স্বরস্বতীর বাল্যকালের মধুর বহুস্মৃতি এখানে রয়েছে। তার মাতুল ক্ষেত্রমোহনের জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল, গতানুগতিক জীবন ধারা থেকে বেরিয়ে এসে জীবন ও সমাজকে নতুন ভাবে দেখা ও চেনা, যার দ্বারা সরস্বতী ভীষণ ভাবে প্রভাহিত হয়েছিলেন।[১] মঙ্গলগঞ্জ নীলকুঠীর সাথে যুক্ত মঙ্গলচন্দ্র আঁশের পুত্র লক্ষণ চন্দ্র আঁশ সম্পর্কে সরস্বতীর মাসির ছেলে। লক্ষন চন্দ্রেরও মাতুলের পথ অনুসরন করে জীবনের দর্শন বদলে যায়, যার দ্বারা স্বরস্বতী দেবীও প্রভাবিত হয়েছিলেন। যাই হোক লক্ষন চন্দ্র ও সরস্বতীর উভয়েরই মাতুলালয় ঐ দত্ত বাড়ি।

নয় বছর কাল পিত্রালয়ে ও মাতুলালয়ে স্নেহে বড় হয়েছিলেন সরস্বতী। এই নয় বছর বয়সেই পিতা কান্তিচন্দ্র কন্যা দায় মুক্ত হন। ১৮৫৭ সালে সরস্বতীর বিবাহ হয়ে যায়। পাত্র বরাহনগর নিবাসী রামসেবক সেনের পুত্র শ্রীনাথ সেন।[২] কিন্তু বিবাহের মাত্র দুই বছর পর ১৮৫৯ সালে নভেম্বরে সরস্বতী সেন বিধবা হন। বাল্য বিধবা, হিন্দু পরিবারে বিশেষ করে শ্বশুরালয়ে তাকে অনেক আচার বিচার, বাদ-অপবাদের সন্মুখীন হতে হয়। এই ঘটনার পর সরস্বতী সেন নিজ গ্রাম খাঁটুরায় মা বাবার কাছে ফিরে আসেন। স্বামীর মৃত্যুতে তাঁর জীবনে এক বড় আঘাত নেমে আসে। তাঁর মনোরাজ্য তখন নানাভাবে তোলপাড় হয়েছিল। সব না বুঝতেই জীবনের সব হারিয়ে ফেলা বড় মর্মান্তিক।এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো ১৮৫৬ সালের ১৩ই জুলাই বিদ্যসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ আইন পাশ করেন। প্রথম বিধবা বিবাহ হয় কুশদহ পরগনার এই খাটুঁরা গ্রামে। খাটুঁরা নিবাসী রামধন তর্কবাগিশের পুত্র শ্রীসচন্দ্র বিদ্যারত্নর সাথে বিবাহ হয় বর্ধমান নিবাসী কালিমতি দেবীর। কিন্তু সরস্বতী সেনের গ্রামে যেখানে তাঁর বিধবা হওয়ার তিন বছর পূর্বে বিধবা বিবাহ হয়েছিল,সেখানে স্বরস্বতীসেনের পুনর্বিবাহ হলনা, এটি তখনকার হিন্দুসমাজের কঠোর রক্ষণশীল তাকেই প্রমানকরে।স্বামীহারা ব্যকুল সরস্বতী একবার বাড়ি একবার মামা বাড়ি করতেন। তাঁর যাতায়াত মাতুল ক্ষেত্রমোহন দত্তের ঘরেই অধিক ছিল। মাতুল ক্ষেত্রমোহন ও মামিমা কুমুদিনীর সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে তাঁর জীবনবোধের পরিবর্তন ঘটতে আরাম্ভ করে।

মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে স্বামী জীবিত থাকে না, সমাজ সংসারের অকল্যান হয়। এ জাতীয় অন্ধ কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে এসে সরস্বতী তার মামিমা, তৎকালীন সমাজের একজন অগ্রণী নারী কুমুদিনীর অনুপ্রেরনায় লেখা পড়ার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই ভাবে স্বামির মৃত্যুর পর সরস্বতীর জীবনে চার বছর কেটে যায়। জীবনের

নানা টানাপোড়নের মধ্য দিয়ে সরস্বতীর চিন্তাজগতে একটা পরিবর্তনের সূচনা হয়। তিনি উপলব্ধি করেন নারী জীবনে শিক্ষা বর্জনীয় নয়। বরং অতি প্রয়োজনীয় অবলম্বন। তাই সরস্বতী একসময় লেখাপড়া শেখার জন্য খুব ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তিনি মেধাবি ও স্মৃতিশক্তি সম্পন্না ছিলেন। পরিস্থিতি তাকে পরিশ্রমি এবং জেদি করে তুলেছিল। এটিতাঁর জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সরস্বতী পনেরো বছর বয়সি মামাতো ভাই শ্রীমন্ত কুমার দত্ত, পিসতুতোভাই গনেশ চন্দ্র ও স্কুল ছাত্র হরিচরন ঘোষের কাছে বর্ণ পরিচয় থেকে কথামালা প্রথমে শিক্ষালাভ করেন। তারপরের একে একে ভূগোল,ইতিহাস, পাটিগণিত, সীতাঁর বনবাস, মেঘনাথ বধ কাব্য প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করেন। এর থেকে প্রমানিত হয় সরস্বতী সেনের কি পরিমান নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় ছিল। তারপরেবামাবোধিনি পত্রিকার অন্তঃপুরে স্ত্রী শিক্ষার অধীনে শিক্ষা গ্রহণকরে ১৮৬৯ ও ১৮৭০ সালে তিনি দুইবার পরীক্ষা দেন ও দুই বারই উত্তীর্ণ হন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

ডিরোজিওর ইয়ং বেঙ্গলের  সদস্য ও নারী মুক্তি আন্দলনের সক্রিয় ব্যক্তিত্ব রামতনু লাহিড়ী মহাশয় তৎকালীন সরকার বাহাদুর দ্বারা সারদা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাবালক পুত্রগনের অভিভাবক নিযুক্ত হয়ে গোবরডাঙ্গাতে আসেন।থাকতেন দত্তবাড়ির ক্ষেত্রমোহন দত্তের আশ্রয়ে। এখানেই সরস্বতী মাঝে মাঝে রামতনু লাহিড়ীর দেখাশুনার জন্য যেতেন। ভাল ভাল খাদ্য প্রস্তুত করে দিতেন। রামতনু বাবু সরস্বতীকে অতীব স্নেহ করতেন। তাঁর দুঃখের জন্য ব্যথিত হতেন, স্নেহ ভরে ‘মা লক্ষ্মী’ বলে সম্বোধন করতেন। গোবরডাঙ্গা ত্যাগ করেও রামতনু লাহিড়ী সরস্বতীকে ভুলতে পারেনি।রামতনু বাবু তাকে কলকাতায় গেলে সাক্ষাৎ করার জন্য আহ্বান করতেন। রামতনু লাহিড়ীর সহযোগিতায় সরস্বতী তাঁর লেখাপড়ার তৃতীয় ধাপ পূর্ণ করেন।[৩] এর মধ্যে ১৮৭৮ সালের অক্টোবর মাসের শেষে পিতাঁর মৃত্যু হলে অসহায় সরস্বতী রামতনু লাহিড়ীর শরণাপন্ন হলেন।

১৮৭৯ সালটি ব্যক্তি হিসাবে সরস্বতী সেনের শিক্ষা জীবনের নতুন অধ্যায়ের সুচনা হয়। এই বছরই ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত একটি মেয়ে কাদম্বরি বসু বেথুন স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করলেন। তাঁর উচ্চ শিক্ষার অভিলাষ পূরনের জন্য “কলেজ অফ বেথুন স্কুল” নামে সারা ভারতে মেয়েদেরপ্রথম কলেজ স্থাপিত হয়।[৪] সেখান থেকে কাদম্বরি বসু পাশ করেন এফ এ বা ফাস্ট অনার্স। একই সাথে দেরাদুন থেকে এফ এ পাস করেন আর এক বাঙালি নারী চন্দ্রমুখী বসু। তিনি এসে ভর্তি হন বেথুন কলেজে। এই সময় বাঙালি মেয়েরা শিক্ষা ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছিল এক ইতিহাস  যার কেন্দ্রস্থল ছিল বেথুন স্কুল। সেই স্কুলেই ভর্তি হলেন খাটুঁরার মেয়ে সরস্বতী সেন। ১৮৭৯ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর ৩১ বছর বয়েসে ভালভাবে লেখাপড়া শিখবার জন্য তিনি বেথুন স্কুলে ভর্তি হন।[৫] এখানেও তিনি যথেষ্ট মর্যাদার সাথে পড়াশোনা শেষ করেন। বেথুন স্কুলেও তিনি পুরস্কার পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বেথুন স্কুলেই তিনি শিক্ষিকা পদে নিযুক্ত হন।

হিন্দু পরিবারে বিধবাদের নানা প্রকারের দুঃখ দুর্দশার মধ্যে জীবন কাটত। একদিকে সমাজের নানাবিধ বিধিনিষেধ, অন্ন বস্ত্রের জন্য পরনির্ভরশীলতা, নানা ধরনের জটিলতা নিয়ে সমাজে থাকতে হত। সরস্বতী সেন বিধবাদের এই মর্ম বেদনা অনুভব করেছিলেন নিজের জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর অবধি বৈধব্যদশা নিয়ে তাকে হিন্দু পরিবারে কাটাতে হয়েছিল। বিধবাদের এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় তাঁর কাছে একমাত্র মনে হয়েছিল সাবলম্বি হওয়া। যখন গৃহের শিক্ষাপর্ব শেষ হয়তখন খাঁটুরা বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার অনুপস্থিতিতে সরস্বতী সেন সেখানে পাঠদান করেন। যখন বেথুন স্কুলে তাঁর শিক্ষাগ্রহণপর্ব শেষ হয় সেখানে শিক্ষিকার পদ খালি হলে তিনি ঐ পদের জন্য আবেদন করেন। তারএই পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেন কমিটির সেক্রেটারি ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষ ব্যাক্তিত্ব মনমোহন ঘোষ মহাশয়। ১৮৮০ সালে ১ লা এপ্রিল তাকে বেথুনস্কুলের শিক্ষিকা পদে নিয়োগ করাহয়। সরস্বতী শিক্ষিকার পদ পেয়ে খুবই আনন্দিত হন। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের প্রায় পঁচিশখানি পত্র লিখে তিনি তার আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। স্কুল বোর্ডিং এ থেকে তিনি শিক্ষকতা করতেন। ছাত্রীদের সাথে তিনি অতি ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন। প্রত্যহ ছাত্রীদের নিয়ে প্রার্থনা

করা, প্রতি রবিবার ব্রাহ্ম মন্দিরে তাদের প্রার্থনা করতেন। সরস্বতী সেনের কর্মের প্রতি নিষ্ঠা ও ভালবাসার জন্য তিনি বেথুন স্কুলের সকল ছাত্রীদের কাছে ও পরিচালক মণ্ডলীর কাছে অনেক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীকালে মাতৃহীনা এক আত্মীয়কন্যার হিতার্থে তিনি শিক্ষকতার পদ ত্যাগ করেন। বেথুন স্কুলে পুনরায় শূন্য পদে কাজের প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাখান করেন। প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাঙ্গন ত্যাগ করে তিনি আত্মনিয়োগ করেন অবহেলিত নারী সমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠার কাজে। সেবাকর্মে আত্মনিয়োগের বাসনায় মনস্থির করেন। কেবলমাত্র সেবা কর্মে আত্মনিয়োগের জন্যই সরস্বতী সেন পরেরবার চাকরি গ্রহন করেননি, সকল প্রস্তাবই তিনি প্রত্যাখান করেছিলেন।

তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু পরিবারের বিধবা মেয়েদের ও বয়স্কা মেয়েদের কাছে শিক্ষারআলো পৌঁছে দেওয়া। এ শিক্ষা তাঁর নিজ জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ। নিজে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অসহায় বা দুঃখী শিশুদের সহায়তায় এগিয়ে যেতেন। হিন্দু, ব্রাহ্মণ, খ্রিস্টান সকল সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেদের সাথে মিশে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখের সব কথা শুনতেন। তাদের বিপদে-আপদে সহায়তা করতেন। শোকাহত পরিবারেরপাশেদাঁড়ানো তাঁর স্বাভাবিক কর্তব্য ছিল। সমাজে বিধবা দুঃখিনী ভগিনীদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার বিষয়ে সরস্বতী সেনের গভীর চিন্তা ছিল। সমাজে বিধবা দুঃখিনী দের দুঃখ দূর করার সদুপায় প্রার্থনা করে "কৌমুদী" রসম্পাদকের নিকট ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বরে পত্র প্রেরন করে লেখেন- "আমরা একে পরাধীন ও একাকিনী তাতে আবার অজ্ঞান ও বিধবা। আমাদের মধ্যে আজও প্রকৃত ভগ্নিভাব হয় নাই।তাহার কারণ আমাদের মন সংকীর্ণ। তজ্জন্য উদার ভাব হয় নাই"।১৮৮০ সালে স্ত্রীলোকেদের জন্য একটি নারী সমাজ স্থাপিত হয়। এই"নারী সমাজে" তিনি নারীদের উন্নতি সাধনও কর্তব্য সম্পর্কে পরপর তিনটি প্রতিবেদন পাঠ করেন। যথাক্রমে ১৮৮০, ১৮৮১ ও ১৮৮২ সালে।[৬] প্রকৃতপক্ষে সরস্বতী সেন বাল্যকালে হিন্দু সমাজে নারীরা যে যন্ত্রণা তৎকালে ভোগ করতেন তা ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখেছেন ও অনুভব করেছেন। তার প্রতিফলনই তার কর্মকাণ্ডের মধ্যে ফুটে উঠছিল।

সরস্বতী সেনের যাবতীয় কর্মের মধ্যে একটি বড় কর্ম হল তাঁর রচনা সমগ্র।তাঁর রচনা গুলির মধ্যে ছিল "প্রার্থনা" যা বামাবোধিনিতে প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও খাটুঁরা গ্রামে কেশব চন্দ্রের ধর্মপ্রচার নিয়ে লেখা, "মাঘোৎসবের প্রার্থনা" নামক কবিতা, সহোদরা ভগ্নী ও ছাত্রীগণের প্রতি তাঁর উপদেশ মূলক রচনা প্রভৃতি। তৎকালীন সমাজ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর সকল অনুভুতি এই সকল রচনার মধ্যে ধরা পড়েছে। সমাজ-ধর্ম, জীবন-ধর্ম ও নারী সমাজের ভাল মন্দ এবং শিক্ষণীয় বিষয় রচনার উপজীব্য হয়েছে তাঁর লেখা এই গ্রন্থগুলি। তৎকালীন হিন্দু সমাজ, এমনকি ব্রাহ্ম সমাজের নারীমুক্তির চিত্র ও তাঁর রচনা সম্ভারের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সরস্বতী সেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, সমাজ সংস্কারক উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট জনের সংস্পর্শে এসেছিলেন। উমেশ চন্দ্র দত্তের ব্যক্তিগত জীবন বিষয়ে করা নানা প্রশ্নের উত্তর সরস্বতী সেন অতি বিচক্ষণতার সাথে প্রদান করেছিলেন এবং ব্যখ্যা করেছিলেন। উমেশচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনে আমোদপ্রমোদ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে সরস্বতী সেন লিখেছিলেন "আমোদ প্রমোদে শারিরিক ও মানসিক উপকার হয় হৃদয়ে সদভাবের উৎকর্ষ হয়।" একেবারে মনবিজ্ঞানের কথা। হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনের উপায় প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখেছিলেন "হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন করিতে জ্ঞান দ্বারা হৃদয়কে মার্জিত করিয়া অজ্ঞান ও কুসংস্কার দূর করা আবশ্যক"। বেথুন স্কুলে থাকাকালীন সময়ে সরস্বতী সেন নারী সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষা এবং বারোটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। "স্ত্রী লোকেদের বিদ্যাশিক্ষা" বিষয়ে তাঁর বক্তব্য আধুনিক কালের। তিনি লিখেছেন "বিদ্যা শিক্ষার অর্থ জ্ঞানলাভ"। ... "যে সকল স্বাভাবিক গুন আছে,সেগুলি জ্ঞানের সহিত বর্ধিত ও মার্জিত হয়"। এই বিষয়গুলি তাঁর প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানের পরিচয় বহন করে।

মামা ক্ষেত্রমোহন দত্ত ও তাহার স্ত্রী কুমুদিনি দেবীর জীবন-দর্শনে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি অনুরাগ জন্মায়।[৭] ব্রাহ্ম সমাজের সাথে তিনি সর্বদাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৭৮ সালের১৯ শে জুন ক্ষেত্রমোহন

দত্ত নিজঅর্থব্যয়ে খাঁটুরাস্থিত ব্রাহ্মমন্দিরের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেন।[৮] সেই উপলক্ষে কেশবচন্দ্র সেন ও এসেছিলেন। স্বরস্বতী দেবীসহ বাড়ির মেয়েরা উপস্থিত ছিলেন। হিন্দুসমাজের কুসংস্কার, নারীর স্বাধীনতাহীনতা তাকে ব্যাথিত করেছিল। ব্রাহ্মসমাজকে তিনি পবিত্রতীর্থ মনে করতেন। রক্ষণশীলতা থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি পরমপিতার চরণে ঠাঁই পেতে চেয়েছিলেন। বহু বাধা সত্বেও তিনি ১৮৭৬ সালে ব্রম্মানন্দ আচার্য ও কেশব চন্দ্র সেনের কাছে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি মামা ক্ষেত্রমোহনের সঙ্গে বেশ কয়েকবার মন্দিরে উপাসনায় যোগ দিয়ে পরম আনন্দ লাভ করতেন। তাঁর মাসতুতোভাই নব বিধান ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য লক্ষ্মণ আঁশের ব্রাহ্মমিশন সংক্রান্ত কাজকর্মও তাঁকে জীবনে চলারপথ চিনতে সহায়তা করেছিল[৯]। তিনি পিত্রালয় ও শ্বশুরালয়য় থেকে কোন সম্পত্তি পান নি। বিবাহ সুত্রে পাওয়া অলংকার বিক্রি করে কিছু টাকা পান। এছাড়া পশমের মোজা, টুপি প্রভৃতি বিক্রি করে এবং বেথুন স্কুলে কার্যকালের ও কাজ শেষের প্রাপ্ত অর্থ জমিয়ে তা থেকেখাঁটুরা ব্রাহ্ম মন্দিরের ব্যায় নির্বাহের জন্য ১৯১৯ সালে তিনি ৮০০০ টাকা দান করেন।[১০] অবশিষ্ট অংশ নিজ ভরণপোষণের জন্য ব্যায় করেন। তিনি ২৬ থেকে ৮২ বছর পর্যন্ত স্বাধীন ভাবে নিজের ভরণপোষণের সব ব্যায় নির্বাহ করতেন।

সরস্বতী সেনের জীবন ও কর্মের যদি মূল্যায়ন করতে হয়তাহলে তাঁর সময় কালের সমাজে চলে যেতে হবে। আজকের দিনের সামাজিক প্রেক্ষাপট বা ভাবনা দিয়ে তাঁর সঠিক মুল্যায়ন কখনই সম্ভব হবে না। তৎকালীন হিন্দু সমাজে নারীর প্রতি উপেক্ষা এবং সংস্কারের নানা বাঁধনে ফেলে নারীর উপর যে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চলত সরস্বতী তা দেখেছিলেন ও নিজে উপলব্ধি করেছেন। সামাজিক নানা বন্ধন নারীকে পরাধীন করেছে এবং তাঁর অজ্ঞানতা, অশিক্ষা তাকে অসহায় করেছে। সরস্বতী সেনের সারাজীবনের লড়াইটা যেন ছিল এরই জন্য যে, সকল অজ্ঞতা দূর করে নারী সমাজে শিক্ষার বিস্তার করা। এর সাহায্যেই নারী সমাজের বিস্তার ঘটবে।তখন পুরুষ শাসিত সমাজেশিক্ষার অভাবে নারীকে বলা হত "অবলা"। শিক্ষার অধিকার নারীর ছিল না। শিক্ষা থাকলে নারী ন্যায় অন্যায় বিচার করতে পারত, প্রতিবাদ করত। তখন সে অবলা হত না, "সবলা" হত। সরস্বতী চাইতেন নারী সবলা হোক। সরস্বতী বুঝেছিলেন শিক্ষা মানুষের জ্ঞানের পরিধি বাড়ায়। তাই কৈশোর অবস্থা থেকে নিজেদের বিদ্যাচর্চার সাথে সাথে তিনি প্রতিবেশী অশিক্ষিত গৃহবধূ ও বিধবাদের শিক্ষাঙ্গনে টেনে এনেছিলেন। তিনি জীবনে যে সবতাগিদ গড়েছিলেন, তার যেন সবটাই পরার্থে ছিল। আত্মীয় স্বজন ও ব্রাম্ম সমাজের ভাই বোনেদের উন্নতি ও মঙ্গল কামনাই তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। তবুও সরস্বতী সেনের শেষ জীবনে একাকীত্ব ছিল। তাঁর কোন পরিবার ছিল না, এমনকি তাঁর থাকার মত বাসস্থান ও ছিল না। তিনি অভাব কষ্ট ভোগ করেছিলেন। শেষ জীবনে ব্রাহ্ম সমাজ এবং পরম ব্রম্মই তাঁর সম্বল ছিল। ১৯২৯ সালে ৮২ বছর বয়েসে খাঁটুঁরা ব্রাম্মসমাজ মন্দিরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সরস্বতী সেনের জীবন তাঁর কার্যকালাপের মধ্য দিয়ে মূল্যায়ন করলে বোঝা যায় তাঁর চিন্তা ভাবনার বড় অংশ জুড়ে ছিল নারী জাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, যা সেই সময়ের সমাজ চিন্তক ও সংস্কারকদের ভাবনার প্রধান বিষয় ছিল। সংস্কারপন্থি ব্রাহ্ম বা হিন্দুদের সঙ্গে রক্ষণশীলদের সংঘাতের সেই যুগে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অগ্রপথিকদের অন্যতম। তাঁর জীবনীমূলক গ্রন্থের রচয়িতা মুরালিধর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন –"ক্ষেত্রমোহন দত্ত তাঁহার পত্নি কুমুদিনী ও সরস্বতী সেনের জীবন ব্রাহ্ম ও হিন্দু ধর্মের সেই সংঘর্ষের যুগে আমাদের নিস্তব্ধ গ্রামে যে আন্দলনের তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহারই ইতিহাস সরস্বতী সেনের জীবনবৃতান্ত, সেই বিরোধের ইতিহাসের এক অধ্যায়।" শিক্ষিতা, সুচিন্তক ও আন্তর্জাতিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ এই নারীরঐতিহাসিক মুল্য নির্ধারণেএকটি কথাই বোধ হয় বলা যায়-তিনি ছিলেন খাঁটুরা গোবরডাঙ্গার প্রথম "সরস্বতী"।

**তথ্যসূত্র –**

১. চক্রবর্তী বিপিন বিহারী ও অন্যান্য,"খাঁটুরার ইতিহাস ও কুশদীপ কাহিনি"; স দীপক কুমার দাঁ গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষৎ, ২০২০ পৃ- ১৮।
২. ব্যানার্জি ডঃ শঙ্কর, "সাহসিনী সরস্বতী সেন ও প্রাসঙ্গিক ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন" ( খাঁটুরাও মঙ্গলগঞ্জ); স. দীপককুমার দাঁ গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষৎ, গোবরডাঙ্গা।মে২০১৯ পৃ- ৩৮,৬৯
৩. শাস্ত্রী শিবনাথ, "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ", এস. কেলাহিড়ী এন্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯০৯, পৃ- ৫৮।
৪. মজুমদার রমেশ চন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস" ৩য় খণ্ড, দিব্য প্রকাশনী, কলকাতা,১৯৭১, পৃ- ৩৯
৫. দাস যোগীন্দ্রনাথ, কুশদহ পত্রিকা (মাসিক) সুকিয়া স্ট্রীট, কলকাতা ১৩১৫ সন আশ্বিন সংখ্যা, পৃ- ২০২।
৬. দাশ সুখেন্দু,"কুশদহনির্বাচিতরচনাসংকলন", গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষৎ,গোবরডাঙ্গা, জুন২০১৬,পৃ-১০৮।
৭. দাশ সুখেন্দু, "বিদ্রোহিণী কুমদিনি "গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষৎ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ- ৪২
৮. দেবী হাসিরাশি, "কুশদহের ইতিহাস"; স. ডঃ সুনীল বিশ্বাস ও অন্যান্য,গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষৎ, হাবরা, জুন ২০২৩, পৃ- ২৩
৯. মণ্ডল নারায়ন, "বনগাঁর স্মরণীয় ও বরণীয় মানুষ", ১ম খণ্ড, অচিন প্রকাশনী, কোলকাতা ২০১৭, পৃ- ২৬৫
১০. ব্যানার্জি শ্রী মুরলিধর, "শ্রীমতী সরস্বতী সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনা চিঠিপত্র সমূহ"; স. দীপককুমার দাঁ গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষৎ, গোবরডাঙ্গা। আগস্ট ২০২০ পৃ- ২৯,৩০